চলমান জীবন জিজ্ঞাসা :
বিবিধ প্রসঙ্গ

সম্পাদনা
ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

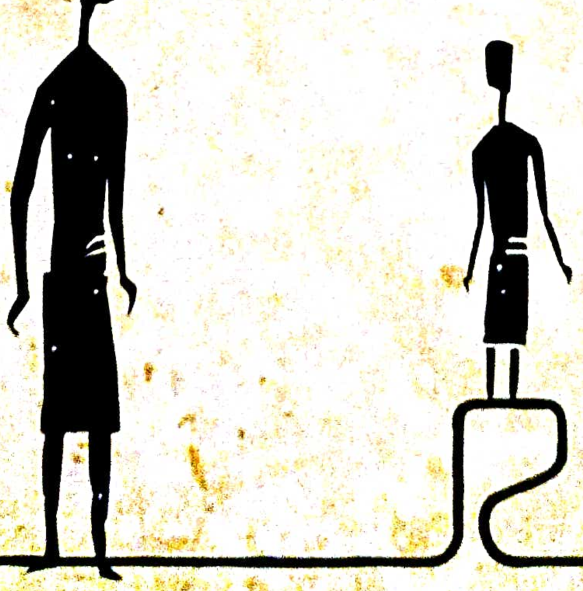

Chalaman Jiban-Jiggasa: Bibidha Prasanga
Edited by Pintu Roychoudhury

© মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISBN: 978-93-93534-11-8

প্রকাশক
অক্ষরযাত্রা প্রকাশন
আনন্দগোপাল হালদার
৭২ দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩
মোবাইল +৯১৯৪৭৪৯০৭৩০৭
ই-মেল: aksharyatrabook@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল

বিনিময়
তিনশত পঁচাত্তর টাকা

সম্পাদকীয় কলম

আদিম মানুষের খোঁজে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান যেমন জরুরি; তেমনি নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ শ্রাস্ত্র, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার পদ্ধতি, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়াও সমান প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার বিষয় কখনোই আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাপ করা যায় না বলেই, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতি-দর্শন ইত্যাদি বহুমুখী ভাবনার বিচ্ছুরণে আমরা জীবনের অন্বয়টিকে বুঝে নিতে চাই। সেই জীবন; যার শুরু নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু চলমান প্রবাহ নিয়ে কোনো প্রশ্ন চলে না।

জীবন মাত্রই চলমান বা গতিশীল; এই পথ ধরে কত যুগ পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম একবিংশ শতকে। এই শতকের তৃতীয় দশক নিজের খেয়ালে মত্ত। ধ্বংসের ভ্রুকুটি লীলা এক হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর মতো। ২০২০ সালের শেষে 'কোভিড' অতিমারীর আকারে যে সর্বাত্মক ধংসলীলা শুরু হয়েছে তার রেশ ২০২২ সালেও কাটল না। এরই মাঝে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ভয়ানক বিপত্তির রণডঙ্কা বাজাতে ব্যস্ত কিছু মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোলুপ মানুষ। ২০২১ সালে আমরা দেখেছি অপটু অশিক্ষিত তালিবানরা নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে। ২০২২ সালে প্রাপ্তি সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার অমানবিক অগ্রাসন নীতি। ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অগুনিত মানুষের জীবনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে রাশিয়া। এরপর আমরা কিসের প্রত্যাশায় বলব মানবাধিকারের কথা!

বিশ্বের যত মানবিক চুক্তি বা কূটনৈতিক চুক্তি; আজ বিপুল প্রশ্নের সম্মুখিন। মানুষের জীবন অথবা জীবনের ইতিহাস দুই ই আজ আক্রান্ত; মানুষ বড়ো অসহায়। ক্ষমতায়নের সেরা নিদর্শন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ভ্লাদিমির পুতিন। অথচ এই ভূমিতেই জন্ম হয়েছিল তলস্তয়, লেনিন, দস্তয়ভ্স্কির। সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্র আজ প্রতিবেশী মানুষের জীবনের ত্রাস। রাশিয়ার দ্বারা ইউক্রেনীয় সভ্যতার ধংস নিশ্চিত ভাবে এক নতুন যুগের বার্তাবহ।

এই নতুন যুগের ধারা বহমান; তারই মাঝে চলতে থাকে জীবনের ভাঙা-গড়া খেলা। কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে একজন বিশিষ্ট মানুষের আবির্ভাব ঘটে সমাজে। সেই মানুষটি প্রভাবিত করে তাঁর চারপাশের জনজীবন। ভারতবর্ষ পুণ্যতীর্থ, তাই এখানে অনেক পুণ্যাত্মা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম হয়েছিল; আবার কালের নিয়মে তাঁরা চলেও গেছেন। আজ প্রেম-ভক্তি ধর্মের নব সংস্করণ ঘটেছে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই আর্থিক মুনাফা অর্জনের বিষয়টি স্থুল অথবা সূক্ষ্ম ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছে। নতুন যুগের এই বৈশিষ্ট্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমাদের কাছে খোলা নেই।

ছয়

কোনো এক সময় লেনিন হয়ত যথার্থই বুঝেছিলেন যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা কখনোই শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। এ কথা আমাদেরও অজানা নয়, বুর্জোয়া ব্যবস্থা তাদের স্বার্থ বিরোধী যেকোন সাহিত্য বা সমালোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্টই প্রতিক্রিয়াশীল। শিল্প-সাহিত্য সেখানে পণ্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এ সম্পর্কে লেলিন তাঁর 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন:

> বুর্জোয়া প্রকাশকের সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক সেখানে কি আপনি স্বাধীন, লেখক মশাই, কিংবা আপনার বুর্জোয়া পাঠককুলের কাছে, যারা দাবী করে আপনাকে অশ্লীল উপন্যাস লিখতে হবে, অশ্লীল ছবি আঁকতে হবে এবং পবিত্র মনোরম শিল্পের 'অপরিহার্য অঙ্গ' হিসেবে বেশ্যাবৃত্তিকে তুলে ধরতে হবে? বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী ও অভিনেতাদের স্বাধীনতা হল আসলে টাকাপয়সা, দুর্নীতি, এবং বেশ্যাবৃত্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার একধরনের মুখোশ অথবা ভণ্ডামির মুখোশ।

এই কথাগুলো সত্যি, কিন্তু আজ এর অস্তিত্ব কোথায়? যাবতীয় কার্যকরী আইন, অনুদান, পরিষেবা ও সম্মান সর্বসাধারণের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। মানুষের জীবন এখন সততই ব্যতিব্যস্ত। যেকোন সমাজে ক্রাইম আর শঠতার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। মানুষ এখন মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। ধর্মীয় অনুশাসন কিংবা রাজানুশাসন, বর্ণাশ্রম প্রথা, সামন্ত শাসন, রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটেছে। যথার্থই অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থার অধীন হয়েছি আমরা। বহুকালের অনুসারিত গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা আজ প্রায় অবলুপ্ত হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় থিতু হতে চাইছে। পরিণতি স্বাপেক্ষে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

সমাজব্যবস্থার অন্তরালেই মানুষে-মানুষে বিভেদের বীজ লুকিয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে তিনটি কারণ কাজ করে, যথা— খাদ্য, জমি এবং যৌনতা। এই জমি বা ভূমির ভেতরেই লুকিয়ে আছে ক্ষমতার যাবতীয় উৎস। রাষ্ট্রের অধিকার, গোষ্ঠীর অধিকার, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধিকারের মূল চাবিকাঠি। প্রত্যেক মানুষ চায় তাকে আর পাঁচজন মানুষ মান্য করুক। মোড়লি বা দাদাগিরি না করলে অন্যেরা তাকে মানবে কেন? এই 'অহং' বোধকে কায়েম করতে গিয়েই শাসকের উত্থান ঘটেছে সমাজে। প্রথমে ছিল রাজতন্ত্র এখন হয়েছে রাজনৈতিকতন্ত্র, উভয়ই শাসনতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য বদ্ধপরিকর। ভারতবর্ষে যুগে যুগে জাতি, বর্ণের বিভাজনের পিছনে এই শাসনযন্ত্র কাজ করে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে নতুন শতাব্দী, নতুন যুগ, নতুন ভাবনা এলেও আস্তিনের তলায় লুকানো সেই পুরনো জাতি ও বর্ণবিদ্বেষের নখ। ভারতের এই হল এক চিরন্তন ব্যাধি। রবিবারের পাতায় পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে জাতিবৈরিতার বিপণন, আজও দলিত ধর্ষণ ও হত্যা, আজও গোপনে জাতিবিদ্বেষী শিক্ষাপ্রদান, আজও প্রান্তিক নারী পাচার সমান্তরাল

ভাবে ঘটে চলেছে। একমাত্র শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই পারে এই বৈষম্যকে দূর করতে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মোহমুক্তির জন্য শিক্ষা লাভের কথা বলেছেন। যথার্থই গণজাগরণের উপায় শিক্ষা বিস্তার, এবং শিক্ষা লাভের ফল হল চেতনার অধিকারের বিস্তৃতি। 'কালান্তর' গ্রন্থের 'সমাধান' প্রবন্ধে বলেছেন:

> অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ। অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে সুবুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটাই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

আধুনিক ভারতে ধর্ম-দর্শনের প্রাণপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ তাঁর আচারে, ব্যবহারে, ভাষণে, রচনায় মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার করে গেছেন সর্বদা। শিকাগো ধর্মসভায় তাঁর প্রথম কথাই ছিল 'আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা...'

বিবেকানন্দের অন্তরাত্মার সত্য ভাষণ ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে বহুবিবৃত পঙ্‌ক্তিগুলি দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ ভাবে আজও ধ্বনিত হয়:

> বহুরূপে সম্মুখে তোমার
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
> জীবে প্রেম করে যেই জন
> সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

মানুষের কথা 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের ভূমিকা অংশের অভিভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না।

বিভেদ মানুষকে সর্বদাই বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিতে চায়। আমরা ভুলে যাই, আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো বিভেদ নেই। বাংলার বাউল সম্প্রদায় উদাত্ত

কণ্ঠে এই সার কথারই প্রচার করে চলেছে:

মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ ধর মানুষ পাবে
মনের মানুষ আছে খামুস হৃদয় মাঝে গোপন ভাবে।

অথবা

মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ রতনধন।
করো সেই মানুষের অন্বেষণ।।

একদা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ থেকে তাঁর নিজের জীবন অনুসন্ধিৎসাকে প্রকাশ করেছেন জীবনের মূল প্রশ্নকে টেনে এনে:

> এ জীবন লইয়া কি করিতে হয়, কি করিব? জীবনের সঙ্গে মানুষের যোগ নিবিড়। যেহেতু জীবন একা চলতে পারে না, তাই মানুষ তার একমাত্র আধার, সে নিজে আধেয়, তাই জীবন ও মানুষ বিচ্ছিন্ন হলেই উভয়ের অস্তিত্বেই পড়ে টান, কোথায় যেন ফাঁকা, শূন্য হয়ে যায়।

এভাবেই অস্তিত্বহীনতার স্বরূপ মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেয়। মানুষ মানেই তার সব রকম ভালো-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া, সঙ্কট-হতাশা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ভাবনা, যন্ত্রণা, পছন্দ, অপছন্দ, ঘৃণা, পাপ-পাপহীনতা, সঙ্গহীনতা ও একাকীত্ববোধ নিয়ে একপ্রকার 'টোটাল ম্যান'। এর থেকে ক্রমিক বিচ্যুতির ফলে মানুষের জীবন হয়ে পড়ে চলৎ-শক্তিহীন, দুর্বল। এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত। বিশ শতকের কবি টি.এস.এলিয়ট রচিত সাহিত্যের সত্যই বাস্তবসত্য হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন 'এভ্রিওয়ান ইজ এলোন, অর ইট সিম টু মী।' তাই এলিয়টের 'উই আর দ্যা হলো মেন' উক্তিটির সারসত্য প্রতিটি সচেতন মানুষের অন্তরের সত্য হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের দুটি বৃহত্তর যুদ্ধে (প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) বিপুল পরিমাণ জীবনহানি ঘটার পর, একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখলো বিশ্ববাসী। বিজ্ঞানের সর্বব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োগে এখনকার মানুষ হয়ে পড়েছে অবহেলিত। তাই হতাশা, উদ্দেশ্যহীনতা, বাসনাহীনতা, বিরক্তি, অবসাদ, অসুস্থতা ইত্যাদি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যথার্থ শিক্ষার অভাবে সমস্যাগুলোর সঠিক চিহ্নিতকরণ না করেই মানুষ অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ শতকের পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবি দস্তয়ভ্স্কি, কিয়েৰ্কেগার্দ, সার্ত্র, ক্যামু, কাফকা প্রমুখ এই সংকটের কথা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁদের রচিত সাহিত্যে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এই সংকটের চিত্র রূপায়িত হয়েছে মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রমুখর লেখনীতে।

গভীরতম প্রতীকের ব্যঞ্জনায় দুঃসহ একাকীত্ববোধ ব্যঞ্জিত হতে দেখা গেছে বাঙালি কবিদের রচনায়। 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মানুষ যেভাবে কাঁদে' কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'একা থাকি বড়ো একা থাকি,/ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মধ্যিখানে একা, দিনে-রাতে, দুঃখ ও সুখে/ছায়া নেই, মায়া নেই, ফুলের বাগানে নেই ফুল'। অথচ, চলমান জীবনকে; জীবনের বেঁচে থাকাকেই শেষপর্যন্ত কবি স্বীকার করে নিয়ে বলতে পারেন— 'তবুও মানুষ বাঁচে, মৃত্যু আছে বলে বেঁচে থাকে/মৃত্যু তো জীবন নয়, ধারাবাহিকতা নয় কোনো।/ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে/বাঁচে, বেঁচে থাকে এই বাঁচতে হবে বলে বেঁচে থাকে।'

সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই নিয়ম। সত্য চিরন্তন, অবশ্যই বিবর্তনের মাধ্যমে সত্য গ্রহণযোগ্য রূপ লাভ করে। সত্যকে কখনোই চেপে রাখা যায় না; তাই যা কিছু সত্য তার মধ্যে একটা গতিময়তা আছে। এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক হতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' (১৯১৪) কাব্যের কথা। এই গ্রন্থটি প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য ছিল— 'ইহা পূর্ববর্তী কাব্যের মত বস্তুবিশ্বের জগৎ নয়; কাল বিশ্বের জগৎ। এ জগতের প্রধান উপাদান কাল এবং তাহার ধর্মই চালিয়া যাওয়া।'

রবীন্দ্র ভাবজগতে এহেন অনুভূতি একেবারে নতুনতর। কবি যেন অনাগত বিভিষীকার বিরুদ্ধে প্রাণের উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত, দৃঢ়, প্রতিবাদী এক কণ্ঠ। বিশেষ করে 'সবুজের অভিযান', 'পাড়ি', 'ঝড়ের খেয়া', 'শঙ্খ', 'নববর্ষের আশীর্বাদ' এই কবিতাগুলির মাধ্যমে কবির মনে একটা বৈশ্বিক চেতনা জন্মলাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীর ক্লাসে সাহিত্য পড়াতে গিয়ে একদা স্বীকার করেছিলেন— বলাকার কবিতাগুলি রচনার সময় আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময় পৃথিবীর একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল।

আসলে এ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব; যা কবিকে উদ্বিগ্ন করলেও হতাশ করতে পারেনি। সবরকম ভয় ও আশঙ্কাকে জয় করে প্রাণের আবেগে এগিয়ে চলার কথাই প্রচার করেছেন কবি:

> এই শুধু জানিয়াছি সার
> তরঙ্গের সাথে লড়ি
> বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
> টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
> আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;

বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী। (ঝড়ের খেয়া)

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় জড়িয়ে থাকা চারপাশের সাধারণ মানুষের কথাই বলেছেন:

> সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত যারা দুর্বল উৎপীড়িত-মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই। এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।

ভারতবর্ষে বহু জাতি ও ধর্মের সহাবস্থান অথচ এই ধর্মকেই হাতিয়ার করে মানুষে মানুষে বিভেদের রাজনীতি চলে। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতায় পীড়িত রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে দেশাচার ও লোকাচারের বন্ধন মুক্ত করে সার্বভৌম স্থাপন করতে সচেতন ভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ধর্মকে তিনি বিশ্ববাসীর সম্পদ করতে চেয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্র ভাবনায় বিশেষ কোনো ধর্মীয় বীজমন্ত্রের স্থান নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গড, আল্লা প্রভৃতি ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক পরিচিতি সেখানে তুচ্ছ। এ সাধনায় গীর্জা, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কোনো উপাসনা গৃহেরও প্রয়োজন নেই। তাই কবি নির্ভয়ে বলতে পারেন:

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

অথবা

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধুলার তলে,

ধর্ম কল্পনার মূল ভিত্তি সহনশীলতা। তাই বিবেকানন্দও বলেছেন:

> I know that this world must go on working wheel within wheel, this intricate mass of machinary, we can make it run smoothly, we can lessen the friction, we can grease the wheels, as it were. How? By recognising the natural necessity of variation. Just as we have recognised unity by our very nature. So we must also recognise variation.

(The way to the realisation of universal religion. Complete works দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৮১)

ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রচারভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। যুগপুরুষ বিবেকানন্দ তাই আমাদেরকে 'অমৃতের পুত্র' বলেছেন; অথচ দিকে দিকে মানুষের বৈরিতা ভারতের

প্রাচীন ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করতে চাইছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের প্রধান সম্পদ। বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিমণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম বৃহত্তম দেশ। এর উত্তর থেকে দক্ষিণের পরিমাপ ৩২১৪ কি.মি, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের পরিমাপ ২৯৩৩ কি.মি। প্রাকৃতিক সমস্ত প্রকার সম্পদের বিপুল সমারোহের সঙ্গে এখানকার মানুষের আচার-সংস্কার-খাদ্য-পরিধেয়-ভাষা-শিক্ষা-রুচির বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। সেই কারণে যুগে যুগে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে জনজীবনকে সচল রাখতে সক্ষম ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের ভারতবর্ষ। বিগত শতকে দেশবিভাগ, পরাধীনতার গ্লানি ভুলে আবার অন্তরের ইচ্ছাশক্তিতে পথ চলছি আমরা। কাশ্মীর নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে মন উচাটন হলেও বাংলার দুই প্রান্ত পুরোনো গ্লানিকে কাটিয়ে উঠতে যথেষ্টই সক্ষম হয়েছে। আজ ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে মধুর সম্পর্কের আবহে বাঙালির জীবনধারায় গতি এসেছে নিঃসন্দেহে। এই অবকাশকে সামনে রেখেই চলমান জীবনের প্রতি ফিরে দেখার একটা দায় থেকেই যায়।

সভ্য সমাজ জীবনের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। অতীতকে স্মরণ করলেই বর্তমানে সঠিক পথ চলা সম্ভব। জীবনের গচ্ছিত মূলধন অনেক। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যেমন পৃথিবীতেই থেকে যায়, কিছু ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র; তেমনি মানুষের জীবনেও ঘটে। চলমান জীবনের প্রত্ন নগরীতে উঁকি দিলেই অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর মেলে। জীবনের দাবি মেনেই সমাজও বদলাতে থাকে। মাতৃতন্ত্র গিয়ে পুরুষতন্ত্র আসে, পুরুষতন্ত্র গিয়ে এখন বানিজ্যতন্ত্রের নির্মম পদচারণা। এই পরিবর্তন অনিবার্য; তবে পরিবর্তনের সঠিক কারণ খুঁজতেই এই ধরনের একটি গ্রন্থ ভাবনার সূচনা।

চলমান জীবন জিজ্ঞাসার ঘুর্ণাবর্তে আবহমান কালের সমাজজীবন বয়ে চলেছে। পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের সীমারেখা মুছে ফেলে আমাদের মানবিকতার অগ্রগতি বিধানের স্বার্থে কাজ করা উচিত। এই জন্য যে কোনো ধরনোর বৈষম্যকে মুছে ফেলতে হবে; যা মানব সভ্যতার অন্তরায়। বিচিত্র ও বিবিধ উন্নতমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জীবনের চর্চা ও চর্যা সফল করার লক্ষ্যেই আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা। এই গ্রন্থটির বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকলেও তাদেরকে মানবিক বিদ্যাচর্চার অন্তভুক্ত করতে সবিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সমাজবিদ্যাচর্চা ও মানবিকিবিদ্যা চর্চার অন্তর্গত আমরা সকলেই। শিশু জন্ম নিয়ে যেভাবে প্রথমেই 'মা' কে অনুভব করে; ঠিক সেভাবেই জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। শিক্ষার প্রধান শর্তই হল চিন্তা করার স্বাধীনতা। চলমান জীবন প্রসঙ্গে আমাদের এই গ্রন্থে অনেক নতুন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় ভাগ করে নিলে ভাবনার ঐক্য স্পষ্ট হয়।

ভাষা সাহিত্য বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে যতদূর সম্ভব কাল্পনিক প্রগলভতাকে এড়িয়ে 'পড়ে পাওয়া দু-য়নার' খোঁজ করা হয়েছে। বিশেষ করে 'Writing Sword of Creating

an Identity' নামক প্রবন্ধটিতে ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের ভাবনার মধ্যে আধুনিকতার বীজ লুকিয়ে আছে। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একজন খ্যাতমানা সাহিত্যিকের কথা উঠে এসেছে, 'শামসুর রাহমান: সময় ও সমাজের কথাকার' নামক রচনায়। উত্তাল সত্তর দশক সকল বাঙালি কবিতাপ্রেমীদের যে তীক্ষ্ণ সামাজিক ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছিল তার বিস্তৃত আলোচনা আছে সত্তর দশকের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতার বিশ্লেষণে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা দুটি প্রবন্ধ আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে তার অবশ্যই একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় লেখা শাস্ত্র, সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, ব্যকরণাদির মধ্যে থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির চলমানতার ধারা শুরু হয়েছিল, তাই সংস্কৃত মহাকাব্যের একটি অন্যতম চরিত্র রূপে মন্থরার প্রসঙ্গ এসেছে এবং ন্যায় শাস্ত্রের মধ্যে যে শব্দের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য আছে তাও এযুগের মানুষের কাছে ঐতিহ্যের বার্তাবহ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য 'সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য, বাস্তবতা ও উপলব্ধি' নামক প্রবন্ধটি। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজ-উ-দৌল্লা। তাঁর সাম্রাজ্য ও প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ ছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে পুরোদমে কব্জা করার সময় বাংলার এই নবাবের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। বিনা বাধায় নিজের স্বদেশভূমিকে ইংরেজদের কাছে সমর্পণ করতে না চেয়ে; তাঁর দেশের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতাই বাংলার জনগণকে আকর্ষিত করেছে। এই বিষয়ক সাহিত্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের সহায়ক হয়েছে 'সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজ-উ-দৌল্লা ও সঈদ আহমেদের শেষ নবাব নাটকে দেশীয় চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ' নামক প্রবন্ধটি।

সমাজ-সংস্কার-শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের সূত্র মেনেই বহুমুখীন সমস্যার সূত্রসন্ধান প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে যাদেরকে প্রান্তবাসী বা অন্ত্যজ করে রাখা হয়েছে তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে বেশ কয়েকটি রচনায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা, আদিবাসী সমাজে লোকচিকিৎসা চর্চা ও অভ্যাস, 'ছিটমহলের সমস্যা, দেহোপজীবিনীর অবস্থান ও অধিকারের লড়াই ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের চলমান সমাজের নিদারুণ ক্ষত হয়েও চরম সত্য। এই বিভাগে দুটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ সততই পাঠকের নজর কাড়বে।

দেশবিভাগ পূর্ববর্তী ভারতীয় বাঙালি সংস্কার বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষী সমাজের ঐতিহ্য ও অবলম্বন। বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজে বিয়ে প্রসঙ্গে বিয়ের গীতে নারীর প্রতি নারীর বৈরী মনোভাবটি স্পষ্ট ও বাস্তব। সমাজে শিক্ষার ভূমিকা প্রসঙ্গে নতুন ভাবনার সহায়ক হয়েছে শিক্ষার একীকরণ প্রসঙ্গটি। এ ছাড়া 'ভারতীয় গণতন্ত্র ও মিডিয়ার ভূমিকা' এবং করোনা আবহে Online Learning বিষয়ক প্রবন্ধ দুটি সমাজ

বিবর্তনের দলিল স্বরূপ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের লেখা 'ব্যবসা ও উদ্ভাবনী চিন্তা' বিষয়ক ভাবনাটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে অত্যন্ত জরুরি পথের দিশারী।

ইতিহাস-দর্শন-শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক রচনাগুলি এযুগের মানুষের কাছে সভ্যতার বহমানতার নির্দশন। বেদের যুগেও যে নারী স্বাধীনতা ছিল তার প্রমাণ পাই 'বেদের যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক প্রবন্ধটির মধ্যে। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে ইতিহাস মনে রেখেছে নারী প্রগতির সহায়ক, নারী শিক্ষার প্রচারক, সমাজ সংস্কারক রূপে। তাঁর নীতি ও আদর্শের সঙ্গে একনিষ্ঠ কর্ম ও ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রভায় বাঙালি জাতি গর্বিত। এহেন ব্যক্তিকে ইতিহাসের আয়নায় অন্বেষণ করা হয়েছে দুটি প্রবন্ধে 'নীতিশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমকালীন বিশ্বে প্রাসঙ্গিকতা', ও অন্যটি হল 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : একটি অন্বেষণ'। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্র রূপে সেই স্বাধীনতাকে জনস্বার্থে বিকশিত করার কাজটি কিন্তু সহজ নয়। ভারতের ইতিহাস ও সংবিধানে খ্যাতমানা জননেতাদের অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক অগ্রাসন নীতিকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে সমস্ত শক্তিশালী দেশ প্রবল প্রতিযোগীতার সম্মুখীন। এমতাবস্থায়, 'সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীজির দর্শন ও আগামী দিনের বিশ্ব' প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে দেখাও একপ্রকার জীবনদর্শন। মানবের ইতিহাস পাঠে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় বলেই মানবদর্শনের অভিমুখ হয় বহুধাবিস্তৃত। এই ধারায় যথোপযুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ— 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিক দর্শনের যোগসূত্র', 'পতিতজনের বন্ধু লালন', 'বিরল পথিক শিবদাস ঘোষ', 'আদিবাসী সমাজে লোকচিকিৎসা: চর্চা ও অভ্যাস, এবং 'Health Risks by Food Additives and Color- An Indian Scenario' ইত্যাদি।

সামগ্রিক ভাবে এই সব রচনার রসাস্বাদনে ব্রতী হয়ে আমাদের মন ও মনন চর্চায় খানিকটা পালের হাওয়া লাগবে বৈকি। আসলে যে জীবনের কথা নিয়ে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা, তার মাত্র একটা সূচনা সংকেত পাওয়া যাবে এখানে। বৃহত্তর আঙ্গিকে চলমান জীবনের কাজটি কোনও দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সম্ভবপর নয়। উন্মুক্ত ও উদারনৈতিক জ্ঞান চেতনার বিকাশের মধ্যে দিয়েই বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবনের হয়ে ওঠাকে বুঝতে পারবে মানুষ।

সমাজ গতিশীল, তার গতিপথে সে কখনো সংকুচিত, কখনো বা প্রসারিত, মানুষ আপন প্রয়োজনে নিজেকে সমাজের বাঁধনে বাঁধে। এ বন্ধন কিন্তু বদ্ধ হয়ে থাকবার জন্য নয়, অগ্রসর হবার জন্য। পর্বতারোহীরা যেমন নিজেদের দড়ি দিয়ে বাঁধে অগ্রসর হবার জন্য। আদর্শ সমাজের বাঁধন সর্বদা জীবনকে গতিপথে মুক্তি দেয়।

এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। যিনি সর্বদা কর্মে ব্যস্ত থেকেও নিরন্তর উৎসাহে আমাকে প্রায় বাধ্য করেছেন এমন একটি বিচিত্র বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য, তিনি

আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. স্বপন কুমার মিশ্র মহাশয়। স্যারের সহযোগীতা ছাড়াও আমাদের শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ড. বিধান সামন্ত মহাশয় এবং IQAC কো-অর্ডিনেটার ড. প্রসেনজিৎ ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই তাদের সাহায্য ও সু-পরামর্শ প্রদানের জন্য। এই গ্রন্থটির আরও একটি বিশেষত্ব হল ভারত ও বাংলাদেশ উভয় প্রান্তের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের একত্র সহাবস্থান। উভয় প্রান্তের প্রাবন্ধিকদের চিন্তাধারা সংযোজিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি যথার্থই আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত। পাশাপাশি মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত সহকর্মী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বন্ধুকে স্বাগত অভিনন্দন জানাই, আমার এই কাজে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখে অথবা মানসিক সাহচর্যে সহায় থাকার জন্য। অন্তিমে উল্লেখযোগ্য 'অক্ষরযাত্রা প্রকাশন'-এর কর্ণধার শ্রীমান আনন্দগোপাল হালদারের কথা। আমার অনুজপ্রতীম নবাগত এই প্রকাশক অত্যন্ত পরিশ্রম করে, স্বল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট নির্ভুল ভাবে কাজটিকে সম্পন্ন করেছে। তথাপি বিক্ষিপ্ত গ্রন্থ মুদ্রণের দায় একমাত্র আমার; এবং আশা করি পাঠককুল আমাকে এই দায় থেকে মুক্ত করবেন তাঁদের নিজেদের গুণে। সর্বোপরি, পাঠক বা সুধীমহলে গ্রন্থটি গৃহীত হলে এই প্রয়াস সফল হয়েছে বলে মনে করব।

ধন্যবাদান্তে

তারিখ ৫.২.২০২২

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক

মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয

সূচিপত্র

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ভাবনা

শামসুর রাহমান: সময় ও সমাজের কথাকার	শামস্ আল্‌দীন	১৭
সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য, উপলব্ধি ও বাস্তবতা	জগন্নাথ মেইকাপ	২৯
সিকান্‌দার আবু জাফরের সিরাজ-উ-দ্দৌলা ও সাঈদ আহমদের শেষ নবাব নাটকে দেশীয় চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ	মো. আব্দুর রহমান	৩৩
আরেক ফাল্গুন: আন্দোলনে নারীর ভূমিকা	নাজিয়া ফেরদৌস	৪৫
নামকরণ সংস্কার ও বর্তমানে তার প্রভাব	সুতপা গিরি	৫১
সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা	বিশ্বজিৎ সামন্ত	৫৮
Writing as a sword of creating an Identity: Sharankumar Limbale's 'Akkarmasi'	Deblina Acharyya	৭৫
The Floating World of Memory and Language: Constructing and Confronting the past in Kazuo Ishiguro's An Artist of the Floating world	Taniya Neogi	৮২
मन्थराचरित्रमन्थनम्	शम्भु-मान्ना	৮৯
न्यायनये शब्दशक्तिविमर्शः	डाँ. मनोरञ्जन दासः	৯৩

সমাজ-সংস্কার-শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা

ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলনসমূহ: একটি পর্যালোচনা	জ্যোতি মিত্র	৯৭
দেহোপজীবিনীর অবস্থান ও অধিকারের লড়াই: পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা	পিন্টু রায়চৌধুরী	১১০
বিয়ের গীত: নারীর প্রতি নারীর বৈরী মনোভাব	নাজিয়া ফেরদৌস	১২৪
ভারতীয় গণতন্ত্র ও মিডিয়ার ভূমিকা	সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী	১২৯
ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলে মহিলাদের অবস্থা ও মানবিধিকার কমিশনের প্রাসঙ্গিকতা (১৯৪৭-২০১৫)	সনাতন অধিকারী	১৩৬
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা	চন্দন নাড়ু	১৪০

দেহোপজীবিনীর অবস্থান ও অধিকারের লড়াই: পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা

পিন্টু রায়চৌধুরী

'দেহোপজীবিনী' অর্থে দেহকে জীবিকা করে বাঁচে যে বা যারা, আসলে যাদের কথা বিশেষ ভাবে বলতে চাই, তারা হলেন পতিতা, গণিকা, বারবণিতা, বারাঙ্গনা কিংবা বেশ্যা। প্রাচীন ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পুরাণ ও সাহিত্যের কল্যাণে 'গণিকা' শব্দটি বহু পরিচিত। শূদ্রক কিংবা বাৎসায়নের রচনায় গণিকার স্থান যৌন-অতিকথার দূরবর্তী। 'পতিতা' নামটিও আমাদের নীতিকাপট্যের ফসল। আর্থসামাজিক আগ্রাসনের শিকার যে মেয়েরা অর্থের বিনিময়ে দেহদান করে থাকে, তারা 'পতিতা', অথচ আমরা পুরুষরা যারা তাদের দেহগুলি ভোগদখল করছি তারা কিন্তু 'পতিত' নই।

খ্রিস্টীয় পুরাণে প্রথম পুরুষ ও নারী আদম-ইভ। ইভ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গ থেকে পতিত হওয়ার পর থেকেই পুরুষের যৌন বাসনার শিকার। মানুষের পরবর্তী জীবন ইতিহাসের ধারা আজও প্রায় একই রয়ে গেছে। একান্ত বাধ্য ভাবে পুরুষকে যৌনসুখ প্রদান, তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ, এবং সব ধরনের সাংসারিক কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন, এই বৃত্তের বাইরে গেলেই সেই নারী হয়ে যায় 'পতিতা', 'কুলটা', 'নষ্টমেয়ে' এবং আরও কতকিছু। মেয়েদের সুরক্ষার জন্য কোনো সমাজে তাদের বোরখা পরতে হয়, কোথাও বা ঘোমটা টানতে হয়, বাল্যবিবাহের পিঁড়িতে বসতে হয়, সিঁদুর মাখতে হয়, কিন্তু যার জন্য এতকিছু করা সে কী করে? তা হল নারীর যৌনতাকে, তার ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতাকে ছেঁটে ফেলার ষড়যন্ত্র। এ ব্যাপারে নারীর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ববোধ যাতে গড়ে না ওঠে তার জন্য পিতৃতন্ত্র সবরকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ঠিক করে দিয়েছে নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান। নারীর অধিকার তথা নিজের ওপর আস্থা বা বিশ্বাসবোধকে চিরস্থায়ী ভাবে ধ্বংস করার জন্য ধর্ম এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই ভূমিকা পালন করেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মানুষ প্রায়শই ভুলে যান যে— নারী কেবল বাধ্য পশু নয়, নারীরও মন আছে; কিন্তু তাদের মনের মতো পুরুষরা হতে পারে না। একাধিক নারীর সঙ্গে পুরুষ মেশে কিন্তু নারী মিশলেই খারাপ কাজ বলে ধরা হয়। সমাজ তাকে খারাপ চোখে দেখে। পুরুষের দ্বারাই কুমারী, বিবাহিত, বিধবা, সমস্ত পর্বের নারীরা নির্যাতিতা হয়, কিন্তু পুরুষের জন্য কোনও শাস্তির বিধান নেই। নারীকে সংযমী হতে বলা হয় পুরুষের নিজের স্বার্থে। এক পুরুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নারী আরও এক পুরুষের জালে আবদ্ধ হয়। নারীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে যথার্থই 'বুর্জোয়ার সম্পত্তি'

হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আজও তাই হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন সারা বিশ্বে এমনকি এপার-ওপার বাংলায় কোথাও অসমান নয়। তবুও পৃথিবীতে উন্নয়নের ধারা তো থেমে থাকে না, বাজার-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই তা এগিয়ে চলে। শুধু পৃথিবীর গোলাকার বৃত্তের মতো নারীর চরিত্রেরও একদিকে আলো পড়ে আর অন্যদিক থেকে যায় অন্ধকার। যেদিকটায় আলো পড়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা তা হয় স্বীকৃত গর্বের বিষয়; যেমন— 'বিবাহব্যবস্থা পদ্ধতি', এর উলটো দিকে আরও একটি সত্য আছে; তা অন্ধকারময় ও ভয়াবহ। আমাদের আলোচনার বিষয় সেই ভয়াবহতার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করা, যেখানে অনুভূত হবে— নারীর যৌনতার দায় ও তার নারীত্বের অভিশাপময় দিকটি। প্রতিনিয়ত নারীর ওপর ঘটে চলা অত্যাচার ও অবক্ষয়ের বর্ণনা; পরিণতিস্বরূপ দেহোজীবিনীর পথ অবলম্বন করার মর্মান্তিক চিত্র।

এখনকার বাজার-অর্থনীতি, বিশ্বায়ন ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝতে হবে বিবাহ যদি মানুষের একমাত্র সুখ ও শান্তিতে থাকার কারণ হতো; তাহলে গোটা বিশ্ব জুড়ে হাজার বছর ধরে চলতে থাকা গণিকালয়গুলি উঠে যেত। কোনো নারীই আর দেহকে জীবিকা করার জন্য এগিয়ে আসতেন না। সামান্য বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও জানেন, গণিকাবৃত্তি তো আর সুখ-শান্তির নিশ্চিত আশ্রয় নয়। পয়সার বিনিময়ে যারা নারীদের কাছে যৌনসুখ পেতে চায়, তারা তো এই সমাজেরই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরুষ। সময় যতো এগোচ্ছে পুরুষের যৌন চাহিদা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। গোটা বিশ্বের মতো ভারতেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাজার-অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা এদিকে নজর রেখে প্রতিটি পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী-শরীরের যৌন আবেদনকে ব্যবহার করছে। ভারতে ক্রমবর্ধমান যৌনচাহিদাও তেমনই স্বাভাবিক ভাবে ডানা মেলতে শিখছে। এখানে চিত্রশিল্পের পীঠস্থান 'মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি' দর্শকদের যৌন চাহিদাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে। হাল আমলে একজন বিখ্যাত পশ্চিমী পর্নস্টার সানি লিওনীকে বলিউডে অভিনেত্রী করা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে জনপ্রিয় খবরের কাগজ 'আনন্দবাজার'-এ প্রায় প্রতিদিন সম্পূর্ণ পাতা জুড়ে লিঙ্গ শক্তিবর্ধক ঔষধের বিজ্ঞাপন এতদিনে সকলের গা-সওয়া হয়ে গেছে। এই পত্রিকাতে ঢালাও ম্যাসেজ পার্লারের হাতছানি অথবা বিভিন্ন ফান ক্লাবে নাম নথিভুক্ত করণের বিজ্ঞাপন নির্দ্বিধায় ছাপা হচ্ছে। পাশাপাশি নাইটক্লাব, বার-এ মহিলাদের অশ্লীল নাচ, ইত্যাদি তো আছেই। মেয়েদের যৌন আবেদনকে কাজে লাগিয়ে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পুঁজিবাদী চক্র দ্রুতহারে কাজ করছে। অথচ যাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই নারীদের মান নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়ে পড়ছে। সমাজে আর নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যৌন সত্যকে চেপে রাখা যাবে না। যৌন চাহিদা শুধু পুরুষের নয় নারীরও আছে, এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। শারীর বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী বিষয়টাকে আমরা এভাবে দেখতে পারি—

১. যৌন চাহিদা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং মানুষের জীবনধারণের মূল চাহিদাগুলির একটি।

২. যেহেতু যৌন চাহিদা মানুষের মুল চাহিদাগুলির একটি, তাই সেই চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে নারী-পুরুষের জীবনে শারীরিক-মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে।

৩. যৌনক্রীড়া একটা আনন্দদায়ক প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই যৌন আনন্দ উপভোগ করে। শুধু প্রজন্ম ধরে রাখার জন্য স্ত্রী-পুরুষ যৌনক্রীড়ায় অংশ নেন না।

৪. যৌনসুখ ও আনন্দ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং সীমাবদ্ধ নয় শুধুমাত্র যৌন প্রত্যঙ্গের ওপর। এটি একটি শারীরিক-মানসিক ক্রিয়া তাই এর সঙ্গে আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা তথা এই বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

মানুষের খাদ্যাভাসের মতোই যৌনতার বিষয়টি স্বাভাবিক ও সত্য। জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই স্বাভাবিক কর্মকে সমাজ সৃষ্টিকারী পুরুষতন্ত্রের ধারকরা নিজেদের স্বার্থে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করেছেন। সেই ইচ্ছার ভয়ংকর পরিণাম দেহোপজীবিনী নারী। আমাদের সমাজে বহু যুগ ধরে দেহোপজীবিনীদের দ্বারা গণিকাবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির পাশে পাশে সম ভাবে চলেছে। এটি একটি জীবন্ত বৃত্তি যেখানে এক ধরনের পরিশ্রমজীবী মহিলারা তাদের পরিশ্রমের জন্য মজুরি পান। এই বৃত্তিতে বা পেশায় নিযুক্ত মহিলারা যে-কোনো দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর এক বিশেষ এবং অপরিহার্য অংশ যারা এর মাধ্যমে নিজেদের এবং আরও অনেকের পেটের ক্ষুধা মেটাচ্ছেন। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এদের কিছু পরিবর্তন হলেও, মূল সমস্যা রয়েই গেছে। আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেহোপজীবিনীদের অবস্থানগত বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ঐতিহাসিক ভাবে পুরাতন মন্দিরগুলি যেমন ছিল গণিকাবৃত্তির পীঠস্থান, এখনও তার পরিচয় বহন করছে বিভিন্ন দেবদাসী প্রথা ও আমাদের পরিচিত কালীঘাটের গণিকালয়।

এই যৌনবৃত্তিকে ঘিরে জীবিকা উপার্জন করছে এক বিশাল সংখ্যক নারী-পুরুষ। প্রথমত, মূল ব্যবসায় নিযুক্ত বহু মহিলার জীবিকা অর্জনের মূল উৎস এটি। এদের আয়ের একাংশ পায় মালকিনরা, আর এক অংশ পায় দালালরা, যারা খদ্দের জোগাড় করে এনে দেয়। গণিকালয়গুলিকে ঘিরে বহু কুটির শিল্প এবং ছোটোখাটো ব্যবসা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মদের আড়ত। মূলত এখানকার ছেলেরাই এই মদের ব্যবসা করে। এ ছাড়াও বহু ডাক্তার এবং হাতুড়ে ডাক্তারদের ক্লিনিক, বিউটিপার্লার, জামাকাপড়ের দোকান, সাজগোজের দোকান, তরকারির বাজার, ভ্যান ও রিক্সা স্ট্যান্ড ইত্যাদি এই গণিকালয় ঘিরে গড়ে ওঠে। এই ব্যবসার বিক্রেতা যৌনকর্মীরা তাদের দেহ বিক্রি করে, আর খদ্দেররা তা অর্থের বিনিময়ে কেনে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গণিকাবৃত্তিকে অসংগঠিক সেবামূলক ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। রাস্তায় হকারি বা চায়ের দোকান বা ছাতা, জুতো সারানোর

দোকানের মতো এই পেশাতে ঢুকতে প্রাথমিক কোনো ব্যয় নেই বা সরকারি কোনও বাধা নেই। আইনগত স্বীকৃতি না থাকলেও এই পেশাকে অস্বীকার করার মতো শক্তি কারোর নেই। কারণ, সমাজের এক বিশাল জনতার বেঁচে থাকার খোরাক এরাই জোগায়। এই জনতার মধ্যে মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, কুলি কেউই বাদ পড়ে না।

অন্য আর পাঁচটা পেশায় মানুষ যে কারণে কাজ করতে যায়, সেভাবেই যৌনব্যবসায় অধিকাংশ মেয়েই আসে পেটের তাড়নায়। যে বিহারী মজুর কলকাতায় রিক্সা চালায় অথবা যে বাঙালি শ্রমিক মিলের ঠিকা কাজ করে, গণিকাদের গল্প তাদের থেকে আলাদা নয়। কিছু মেয়ে এখানে বিক্রি হয়ে চলে আসে, আবার বেশ কিছু মেয়ে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এখানে এসে পৌঁছায়— অনেক সময়েই পুরোপুরি সবকিছু না জেনেই, অর্থাৎ আধা ইচ্ছা বা আধা অনিচ্ছায় ভর করে। আমাদের সমাজের মেয়েদের, বিশেষত গরিব ক্ষমতাহীন মেয়েদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিতা এবং অর্থনৈতিক ভাবে নিরাপত্তাহীন একজন নারী একান্ত বাধ্য হয়েই এই পেশাকে গ্রহণ করে। তবে ইপ্সিত ভোগসুখের কামনায় কিছু কিছু নারী স্বেচ্ছাতেও এই পেশায় চলে আসে। অবশ্য, যেভাবেই এই পেশায় আসুক না কেন, একবার এই পথে চলে এলে তাকে সর্বোত ভাবেই শোষিত হতে হয়, সমাজের অপমান ও ঘৃণা তখন হয়ে পড়ে নিত্য সঙ্গী। এ ছাড়া থাকে নানান প্রকার সংক্রমণের সম্ভাবনা, বারবার অবাঞ্ছিত গর্ভ মোচনের যন্ত্রণা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্নান ও শৌচকর্মের ব্যবস্থা, দালালদের অত্যাচার, পুলিশের জুলুম, গুণ্ডা-মস্তানদের দ্বারা প্রহৃত হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি। পেশা থাকলেই পেশাজীবীর প্রতি শোষণ থাকবে, তাই যৌনকর্মীর পেশায় অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাও ভয়াবহ। সব পেশা বা কাজের ক্ষেত্রেই এ ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ আছে। সেই জন্যই শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত লড়াই-এর প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। যৌন রাজনীতিতে জালিয়াতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, নইলে হাজার হাজার বছর ধরে দেশে দেশে কি চালু রাখা যেত নারীর যৌনাঙ্গ ছেদন থেকে সতীদাহের পালা। আজ যৌনকর্মীরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন বলেই না পিতৃতন্ত্রের এত ভয়। এই পেশাজীবী নারীই গড়ে তুলছেন আগামী দিনের নারী আন্দোলনের ভিত্তি। সারা বিশ্বে তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিচার করে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও সরকারের পক্ষে থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, কিন্তু সবই পরবর্তীকালে সাময়িক ও লোক দেখানো বলে প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে মানুষের নিরপেক্ষ স্বার্থরক্ষার তাগিদে 'NGO'-এর অবতারণা।

'NGO' অর্থাৎ 'Non-Government Organization' এমন একটি সংগঠন যা সরকারের কোনো অংশ নয় আবার যা লাভের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে না। সাধারণ ভাবে সমাজ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা প্রসূত যে-কোনো সাধারণ মানুষের সংগঠন। ব্যবসায়ী বা

যে কেউ 'NGO' খুলতে পারে। 'NGO' শব্দটি প্রথম গঠিত হয়েছিল যখন Uniter Nations বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময় কিছু বিশেষজ্ঞ মাধ্যম ও তার প্রতিনিধিদের সাহায্য নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র নিজেও একটি 'Inter-Government Organization' বা সম্পূর্ণ ভাবে সরকারি সংগঠন নয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রের কাজকর্ম সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পরবর্তীকালে এই পরিকাঠামোটিকে মাথায় রেখেই 'NGO'-এর উৎপত্তি। 'NGO' আসলে যে-কোনো লাভজনক ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে সামাজিক উন্নতিকল্পে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে। একটি যথার্থ 'NGO' বলতে বোঝায়, যার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণয়নের স্বার্থ নেই। একমাত্র সমাজ ও মানুষের হিতসাধন করাই এর লক্ষ্য। 'Non-Government Organization' শব্দটার উৎপত্তি ১৯৪৫ খ্রিস্টব্দে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে গবেষণা করে দেখা গেছে— 'NGO' জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট বিশ্বাসের এবং জনপ্রিয় একটি বিষয়। জনপ্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায় 'United States'-এ 'NGO'-র সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন, রাশিয়াতে ২৭৭,০০০ আর ভারতে এর সংখ্যা ২ মিলিয়ন, ২০০৯-এর হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে যা আরও বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ৬০০ ভারতবাসী পিছু একটি করে 'NGO' বিদ্যমান, এই সংখ্যা অনেকসময় প্রাইমারি স্কুলের সমান। (NGO Wekipedia, google এর তথ্য অনুযায়ী)

এখান থেকে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল— পাশ্চাত্যে 'NGO' ভাবনার সূত্রপাত হলেও ভারতবর্ষে এর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, জনপ্রিয়তার নিরিখে বিশ্বের মধ্যে এগিয়ে। এর পিছনে নির্দিষ্ট কিছু কারণ অবশ্যই আছে এবং সেগুলি হল—

১. ভারতবর্ষে গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা বেশি।
২. শ্রেণি শোষণের নির্দিষ্ট ইতিহাস ছিল, এখনও তা চলছে।
৩. জাতপাতের সমস্যা সংবিধানে স্বীকৃত নয়, অন্তরে প্রতিপালিত।
৪. শিক্ষার সার্বিক প্রসারে ব্যর্থ, শিক্ষানীতি ভ্রান্ত।
৫. রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব সামাজিক নয়, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত।
৬. গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন।
৭. প্রতি বছর অপুষ্টি ও অনাহারে বহু সংখ্যক মানুষ মৃত হয়।
৮. সরকারি চিকিৎসা গ্রাম ও পশ্চায়েত স্তরে অতি নিম্নমানের।
৯. কন্যা ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ হলেও এখনও পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।
১০. বৃহত্তর সমাজে নারী স্বাধীনতা ভালো চোখে দেখা হয় না।
১১. অসবর্ণ বিবাহ বা প্রেম অধিকাংশ পরিবারে স্বীকৃত নয়।
১২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি কাজে ঘুষ বা সুপারিশ প্রথা চলে।
১৩. অনেক পরিবার নারীর উচ্চ শিক্ষা বা সামান্য শিক্ষার পরিপন্থী।

১৪. অধিকাংশ পুরুষের চোখেই নারী যৌনতার প্রতীক মাত্র।
১৫. নারী যৌনকর্মীরা সকলের চোখেই মনুষ্যেতর ইতর প্রাণী যেন।
১৬. যৌন আলোচনা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ পূর্ণমাত্রায় অসহিষ্ণু ও অজ্ঞতাসম্পন্ন।
১৭. যথার্থ যৌন জ্ঞান না থাকার কারণে যৌন ও গুপ্ত রোগের আধিক্য।
১৮. নারীদের হীনমন্যতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা।
১৯. যৌন ব্যবসাকে কাজে লাগিয়ে বাজার অর্থনীতির সমৃদ্ধি বাসনা।
২০. ভয় দেখিয়ে, ঠকিয়ে অথবা জোর করে নারীদের যৌনব্যবসায় নামানো।
২১. সমাজ বা রাষ্ট্রের ধরি জল না ছুঁই পানি অবস্থায় অনৈতিক কার্য বৃদ্ধির সুযোগ।
২২. সমাজে নষ্ট মেয়ে ও ভালো মেয়ের তত্ত্বের প্রভাব ও তীব্রতা।
২৩. নষ্ট মেয়েদের পুনরায় ভালো হওয়ার সুযোগ না দেওয়া।
২৪. নষ্ট মেয়েদের দ্রুততার সঙ্গে চিহ্নিত করে তাদেরকে অনৈতিক কার্যে লিপ্ত করা।
২৫. একাধিক অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা 'এডস্' ব্যাধির সংক্রমণ সম্প্রসারণ।
২৬. অসুরক্ষিত অনৈতিক কার্যে লিপ্ত দুর্বল প্রতিপক্ষকে অর্থনৈতিক শোষণ।
২৭. শিশু শ্রমিক নিয়োগ ও শিশু শ্রম আদায় করা।
২৮. গুন্ডা, তোলাবাজ, দুর্বৃত্ত ও অসামাজিকদের পুলিশি সহযোগিতা প্রদান।
২৯. ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস, যক্ষ্মা, ক্যানসার, চর্মরোগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব।
৩০. শ্রমিক, গৃহবধু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অসংগঠিত হকার, ছোট ব্যবসায়ী, গৃহপরিচারিকা, বেসরকারি সংস্থার কর্মরত নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়।

কোনো নির্দিষ্ট আইনে উপরিবর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে যারা বঞ্চনার শিকার হয় তারা কেউই দ্রুততার সহিত প্রতিকার পায় না। এই সমস্তকিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের কর্মসূচি গ্রহণ করে বিভিন্ন NGO। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যক্তি, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী যে কেউ NGO গঠন করে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, এখানেই একটা NGO এর সার্থকতা। ভারতে অবস্থিত NGO গুলি এইসমস্ত ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত কাজ করে আসছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি NGO 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'।

দুর্বার এমন একটি NGO যারা মূলত কাজ করে সেক্স ওয়ার্কারস্ বা যৌনকর্মীদের জন্য। এদের মধ্যে মহিলা যৌনকর্মী বা তথাকথিত গণিকা, বেশ্যা এরাই মুখ্য; মহিলা যৌনকর্মীরা দেহোপজীবিনী হলেও আদতে মহিলা। তারা কেউই আমাদের সমাজ বিচ্যুত অদেখা অজানা বস্তু নয়, আদ্যপান্ত একজন নারী। আমাদের চোখে দেখা মা, মাসি, বোন, স্ত্রী, কন্যা, কাকিমা, দিদি বা বৌদি। অথচ আমাদের সমাজে তাদেরকে অচ্ছুত ও বর্জনীয় করে রাখা হয়েছে। বর্জনীয় হলেও সমাজ গর্হিত পুরুষকুল তাদের কাছেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যাচ্ছে। দিনের

আলোয় লুকিয়ে, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে নানাভাবে যৌনসুখ আদায় করে ফিরে আসছে। বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের নিরাপত্তা যৌনকর্মীরা পান না। উপরন্তু কপালে জোটে মালকিন, মস্তান ও পুলিশের অত্যাচার এবং বিভিন্ন সংক্রামক যৌনরোগ, যা কখনো মারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়। যৌনকর্মীদের আয়ের উৎস বেশিদিন স্থায়ী নয়, যৌবন চলে গেলে আর তার কোনো দাম থাকে না। যেখানে ব্যবসায়িক ভাবে যৌনকর্ম চলে সেখানকার চারপাশের পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর। স্নানাগার ও শৌচাগার দুর্গন্ধময়, অন্ধকার ও নোংরা। দেহোপজীবিনীদের সন্তানদের যথার্থ পিতৃপরিচয়ের অভাবে অসম্ভব সামাজিক সংকটের মুখে পড়তে হয়। স্কুল শিক্ষা থেকে শিল্প ও সংস্কৃতি মুলক কাজে তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। যৌনকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা দানের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা কেউই দেন না। তাদের জীবনটা প্রায়শই উত্তেজনাপূর্ণ আপেক্ষিকতার সূত্রে আবদ্ধ, যার পরিণতি মর্মান্তিক। যৌনকর্মীদের জীবনে কোনও বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থাকে না।

বৈচিত্র্যের দেশ ভারতে যতগুলি যৌনপল্লি আছে, সেগুলির মধ্যে কলকাতার সোনাগাছি সেরা। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়ো নিষিদ্ধ বা যৌনপল্লি। এখানে বর্তমানে প্রায় ১১০০০ দেহোপজীবিনী যৌন কর্মের জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্বে গ্রাম-বাংলার অশিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের আধিক্য থাকলেও বর্তমানে রাজস্থানী, নেপালী মেয়েদের বৃদ্ধি চোখে পড়বে। সোনাগাছির অবস্থান কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, শোভা জার, বিডন স্ট্রিট অঞ্চল জুড়ে। এখানে স্বল্প সময় থেকে এক রাতের যৌন মজুরির মূল্য ৩০০টাকা থেকে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য আছে। তবে সবক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারিত থাকে না, দরাদরি করতে হয়, যে ধরনের যৌনতৃপ্তি গ্রাহক আশা করেন সেই ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এখানে যৌনকর্মে লিপ্ত অসংখ্য দেহোপজীবিনীদের যথার্থ জ্ঞান ও শিক্ষার আলো প্রদান করে একটি NGO, যার নাম 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি।'

দুর্বারের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস: ভারত সরকারের দ্বারা 'All India Institute of Hygeine & Public Health' (AIIH & PH) এর এইচ.আই.ভি./এড্স সংক্রমণ প্রতিরোধ কর্মসূচি চালু করতে গিয়ে সোনগাছি অঞ্চলে ড. স্মরজিৎ জানা ও তার সহকর্মীরা যৌনকর্মীদের জীবনযাপন পদ্ধতি দেখে চমকে ওঠেন। এখানকার সামাজিক ব্যাধির ভয়াবহতা তখন মানবিকতার সমস্ত মাত্রা লঙ্ঘন করেছিল। সাধারণ শ্রমিকের থেকে বহুগুণ বেশি অত্যাচার চলত তখন যৌনকর্মীদের ওপর। অথচ শহুরে শিক্ষিত ও প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলের নাকের ডগাতেই চলত এই নৃশংস অত্যাচার। কন্ডোম ছাড়াই যৌনকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হতেন যৌনকর্মীরা। সমীক্ষায় দেখা গেছে যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে ঘটা মোট অত্যাচারের ঘটনার মধ্যে পুলিশি অত্যাচার ৩১.১৪ শতাংশ, গুণ্ডা-মস্তানদের অত্যাচার ৩২.০৪ শতাংশ, ২৬ শতাংশ ছিল তাদের বাবু বা প্রিয়পাত্রের অত্যাচার আর বাকিটা অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে।

শোষণ, হিংসাত্মক ধরপাকড়, নির্মম পুলিশি রেইড, ভয়/হুমকি, অশ্লীল গালিগালাজ, মারধোর করা, নিগ্রহ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা লেগেই থাকত। ড. জানা তখনই বুঝেছিলেন এখানে সচেতনতার প্রসার করার কাজ একেবারে সহজ হবে না।

দুর্বারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের সর্বোচ্চ নিষ্পেষিত, শোষিত ও অত্যাচারিত মেয়েদের জন্য 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' লড়ে চলেছে। আজ থেকে ২৪ বছর পূর্বে এই প্রকল্পের শুরু থেকেই দুর্বারকে ভয়ংকর কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রথমে প্রকল্পের কর্তা ব্যক্তিরা যৌনকর্মীদের মধ্যে থেকে কিছুজনকে বেছে নিয়ে এইচ.আই. ভি-র বিষয়ে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে তাদেরকে তৈরি করেছিলেন। ওই স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজ ছিল যৌনপল্লির ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের এডস্ রোগ সম্পর্কে বোঝানো, তাদেরকে কন্ডোম ব্যবহারে উৎসাহিত করা, যৌন রোগের চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ওই স্বাস্থ্যকর্মীদের বেশিরভাগ অশিক্ষিত থাকায় তাদেরকে শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষাদানের লক্ষ্যে স্কুল ভাড়া নেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে দুর্বারের মেডিকেল ক্লিনিকের বাইরের চাতালে ৩০-৩৫ জনকে নিয়ে স্কুলের কাজ শুরু করার পর পাড়ার মস্তান ও নেতৃবর্গ হুমকি দিয়ে স্কুল তুলে দেয়। তাদের বক্তব্য— খানকি্দের নিয়ে ওসব অধিকার-অধিকার ফলানো যাবে না। এরফলে এলাকার কালচার নষ্ট হবে, তাই স্কুল বন্ধ করতে হবে। অতএব স্কুল বন্ধ।

এরপর ১৯৯৪ নাগাদ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্পের অন্তর্গত পিয়ার এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় যৌনকর্মীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে ক্লিনিকের কাজকর্ম, ছোটো ছোটো নার্সিং-এর বিষয়, চিকিৎসা কার্ড পূরণ, রক্ত টানা ইত্যাদি শেখানো হয়। সে সময় যৌনপল্লিগুলিতে মহিলাকর্মী পাওয়া দুষ্কর ছিল বলে সাহায্যকারী নার্সদেরকে যৌনপল্লির কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়। কিন্তু চারিদিকে তখন হৈ হৈ পড়ে যায়, সকলে বলে— কি আস্পর্ধা বেশ্যাদের নাসিংকর্মী বানানো হবে? আসলে একজন সাধারণ নারী আর একজন যৌনকর্মীকে এক মাপকাঠিতে মাপতে নারাজ আমাদের সমাজ।

এই বিষয়টা শুধু যৌনকর্মীতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও দুর্বারের একই অভিজ্ঞতা হল। অনেকেই যখন তাদের সন্তানদের পড়ানোর আগ্রহ জাহির করল তখনও সেই অসহিষ্ণুতা। আশেপাশে সব স্কুল মানা করে দিল। একজন প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য ছিল— 'এতে স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হবে।' অবশেষে বারুইপুরে জমি কিনে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য হোস্টেল বানানোর পরেও কিছু মানুষজন চোটপাট করল, সেই সুযোগ এলাকার দাগী মস্তানরাও ভিড়ে গেল। শেষপর্যন্ত মস্তানের গুলি খেয়ে মরতে হল হোস্টেলের দারোয়ানকে।

এমন আরও অনেক ঘটনা জড়িয়ে আছে দুর্বারের জীবনে। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যৌনকর্মীরা যখন তাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তুলতে চাইল ১৯৯৫ সালে, তখন এ রাজ্যের সরকারি দপ্তর বাধা দিয়েছিল। আইনের বই ঘেঁটে নৈতিক চরিত্রের দায় দেখিয়ে তারা যৌনকর্মীদের হতাশ করেছিল। তবে মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় যৌনকর্মীরা শেষপর্যন্ত নিজেদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি খুলতে পেরেছিলেন।

যৌনকর্মীদের কাছে পুলিশ-মস্তান নামক প্রথম বর্গ আর মধবিত্ত সামাজিক নামক দ্বিতীয় বর্গের অত্যাচার ও ভণ্ডামি ছাড়াও ছিল তথাকথিত তৃতীয় বর্গের চাপ। এরা হলেন সমাজসেবী, অ্যাক্টিভিস্ট, প্রমুখ। এদের একটাই কথা যৌন পেশার বিলোপ এবং প্রয়োজনে যারা পেশায় স্ব-ইচ্ছায় আছেন তাদেরককেও জোর করে পুনর্বাসন প্রদান। ১৯৯৭ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় যৌনকর্মী সম্মেলন করার সময় এইসব সমাজকর্মী ও দেশপ্রেমী মানুষরা প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। সব বাধাকে অতিক্রম করে দুর্বার ২০১২-তে সাত দিনের এক অনবদ্য সম্মেলন করে তাদের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে।

এরপর আরও একবর্গের মানুষ যৌনকর্মীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, যাদেরকে আমরা শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলিতে ফেলতে পারি। তবে বাকি তিন বর্গের তুলনায় এই বর্গের মানুষরা বেশি সহজ ও স্বাভাবিক। মাঠে-ঘাটে খেটে খাওয়া মানুষজন, পোড়খাওয়া ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের কাছে কিন্তু যৌনকর্মীদের শ্রমিকের অধিকার চাওয়াটা কোনো বিতর্কের বিষয়ই নয়। শুধু ট্রেড-ইউনিয়নই নয়, দেশের ও রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই পজেটিভ। ১৯৯৭ সালে যৌনকর্মীদের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত তাদের দাবির সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যৌনকর্মী প্রতিনিধিকে সসম্মানে ডেকেছিলেন। এই শহরের মহানাগরিক যৌনপল্লিতে ঢুকে তাদের হাতে স্বাস্থ্যবীমার শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন। সুব্রত মুখার্জী থেকে শুরু করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ দে-রা যৌনকর্মীদের মিছিলে হেঁটেছেন। সময়টা সত্যিই একটু একটু করে পালটাচ্ছে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির হাত ধরে। ১৯৯২ থেকে পথচলা শুরু করে আজপর্যন্ত কয়েকটি ধাপে ধাপে দুর্বার কাজ করে চলেছে।

প্রথম ধাপ/ পর্যায়ে (১৯৯২-১৯৯৭) যৌনকর্মীদের একত্রিত তকে তাঁদের আত্মসম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সমস্ত যৌনকর্মীকে একত্রিত হতে বলা হয়েছে। এই পর্বে USHA Co-opcrative society স্থাপন হয়েছে। সাংস্কৃতিক শাখা খোলা হয়েছে 'কোমল গান্ধার'।

দ্বিতীয় ধাপ/পর্যায়ে (১৯৯৮-২০০২) যৌনকর্মীদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তাদের হাতে (DMSC) নীতি-প্রকল্প রূপায়নের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই পর্বে। যৌনকর্মের সাথে জড়িত কর্মীদের চারপাশে জগৎকে চিনতে শেখানো হয়েছে। HIV সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালে সম্মেলনে সমাজে তাদের চৌহদ্দি, কাজের ব্যাপারে

জড়িত পঞ্চাশের বেশি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেখানে ৪০,০০০-এর বেশি যৌনকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন। 'Mamata Care & Treatment Center' প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে HIV Positive মহিলাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রদান করছে। যারা এই কাজে অপহৃতা হয়ে আসছে তাদের শনাক্তকরণ করে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে 'Self-Regulatory Bord' (SRB) এর মাধ্যমে। যৌনকর্মীদের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠাগার নির্মাণ করা হয়েছে কলকাতা ও কন্টাই শহরে।

তৃতীয় ধাপ/পর্যায় (২০০৩-২০০৭) যৌনকর্মীদের শিক্ষণীয় বিষয়ের পদ্ধতি ও পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন করার দিকে জোড় দেওয়া হয়েছে এই পর্যায়ে। দুর্বার সোনাগাছির সমস্ত স্তরে কর্মীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এই পর্বে HIV Programme সার্বিক সাফল্য পেয়েছে। সোনাগাছির প্রকল্পকে DFID এবং বিল গেটস্ ফাউন্ডেশন স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মডেলকে ভারতের অন্যান্য ছ'টি রাজ্য যেখানে HIV প্রকোপিত সেখানে গ্রহণ করতে বলেছে। সমগ্র প্রকল্পের সার্থকতাকে চিহ্নিত করা, আরও উন্নত পর্যায়ের পরিষেবা প্রদান করা এই পর্বের লক্ষ্য। ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার গবেষণায় নামতে চায় দুর্বার।

চতুর্থ ধাপ/ পর্যায় (২০০৮-২০১৫) দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি যৌনকর্মীদের অধিকারকে বিজ্ঞান সম্মত ও আধুনিক রূপদানের প্রচেষ্টা করেছেন এই পর্যায়ে। এখানকার যৌনকর্মী বা দেহোপজীবিনীদের মধ্যে ব্যক্তি সত্তার উন্নতি এখন চোখে পড়ার মতো। ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এই ক'দিনের সপ্তম যৌনকর্মী সম্মেলন বা উৎসবে ভারতের ১৬ টি রাজ্যের অসংখ্য কর্মীরা এসেছিলেন। সেখানে নারীর অধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে 'Immoral Trafficking Preventation Act' (ITPA) এর পরিবর্তনের সপক্ষে সওয়াল ওঠে। যৌনকর্মীরা কেবল সম্মেলন, দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ইত্যাদি করেই ক্ষান্ত নয়, তারা সার্বজনীন দুর্গাপূজা করার ইচ্ছাকেও আন্দোলনের মাধ্যমে সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন। এখন সোনাগাছির মেয়েরা খদ্দের পছন্দ না হলে তাকে সরাসরি না করে দিতে পারে। আগামী দিনেও তারা যৌনকর্মের পেশাগত অধিকার পাবে, এই ধারণা একেবারে অমূলক নয়। দুর্বারের অন্যতম দাবি কেবল সেই একমাত্র লক্ষ্যে, অর্থাৎ যৌনকর্মীদের শ্রমের অধিকার। এটা অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ—

১. শ্রমিকের অধিকার পেলে যৌনপল্লিগুলিতে পুলিশের ধরপাকড় বন্ধ হবে। যৌনকর্মকে খারাপ বলে ধরে নিয়ে আগে যখন-তখন যৌনকর্মীদেরও খদ্দেরদের থানায় চালান করে অত্যাচার করা হত। ভারত সরকার কৃত ITPA (ইম্‌মরাল ট্রাফিক প্রিভেনশান অ্যাক্ট) এর ৮নং ধারায় যা ছিল আইনসিদ্ধ। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়, এই আইনের সাহায্য নিয়ে স্ব-ইচ্ছাধীন

যৌনকর্মীদের ওপর অমানবিক ব্যবহার করা পুলিশের পক্ষে সহজ হয়। সেই কারণেই দুর্বার ITPA আইনের বিরোধিতা করে। শ্রমিকের অধিকার পেলে যৌনকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে খদ্দেরদের ধরে নিয়ে যাওয়া বন্ধ হবে।

২. শ্রমিকের অধিকার পেলে যৌনকর্মীরা ঘরভাড়ার রসিদ পাবেন। বর্তমানে ITPA ৩.১ ধারার জন্য কোনো যৌনকর্মী ঘরভাড়ার রসিদ পান না। কারণ, আইন অনুযায়ী যৌন পরিষেবা কর্মের জন্য ঘরভাড়া দেওয়া বা নেওয়া অপরাধ। ফলে এই সুযোগটা ব্যবহার করে বাড়িওয়ালারা যে-কোনো তুচ্ছ কারণে যৌনকর্মীদের তুলে দেওয়ার ভয় দেখান।

৩. শ্রমিকের অধিকার পেলে যৌনকর্মীদের ওপর প্রতিনিয়ত ঘটে চলা শারীরিক অত্যাচার ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে তারা থানায় FIR করতে পারবে। যৌনকর্মীরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা কণ্ডোম ছাড়া যৌন কাজ করতে না বলার অধিকার পাবেন।

৪. শ্রমিকের অধিকার পেলে যখন-তখন পাড়া থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া বন্ধ হবে। যে-কোনো এলাকা থেকে উচ্ছেদ মানবতা বিরোধী হলেও খারাপ পেশার দোহাই দিয়ে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করে দেওয়া সহজ। যথার্থ অধিকার থাকলে যৌনকর্মীরা ঘর হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে না।

৫. যৌনকর্মীরা যখন খুশি নিজের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে পারবেন এবং যেখানে খুশি বসবাস করতে পারবেন। যৌনপেশায় নামার পর, একবার তার মাথায় যৌনকর্মীর ছাপ পড়লে কোনো দেহোপজীবিনীরাই আর দেশে বা গ্রামে ফিরে যেতে পারে না। শ্রমিকের অধিকার পেলে তাদের আর ঘর হারানোর ভয় থাকবে না।

যৌন ব্যবসার ইতিহাস ও বর্তমানের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি আর কোনো নতুন আইন চায় না, তারা চায় যৌনকর্মীদের বা দেহোপজীবিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার— পেশার চৌহদ্দিতে এবং পেশার বাইরে। এরজন্য দুর্বার তাদের সোনাগাছি প্রকল্পকে বিশ্বের কাছে একটা আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত এডস্ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অন্যতম শর্ত হলেও যৌনকর্মীদের এবং তাদের সন্তানদের সার্বিক উন্নতিকল্পে দুর্বারের বহুমুখী প্রয়াস যে-কোনো প্রশংসার অতীত।

দুর্বারকে অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গের যৌনপল্লিগুলিতে যে সচেতনতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রতিদিনের জোরজুলুম আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার যৌনকর্মী তাদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছেন। সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা-মিলনমেলা- আলোচনাচক্র-পত্রিকা/পুস্তিকা/গ্রন্থ প্রকাশ-স্বাস্থ্যপ্রকল্প-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এইসব যৌনকর্মীরা তাদের জীবন ও

জীবিকার মান উন্নয়নে, যৌনদাসী থেকে যৌনপ্রেমিকের আইনি মর্যাদার উত্তরণের কর্মকাণ্ডে ব্রতী। দুর্বারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি করা একাধিক প্রকল্প ও কর্মসূচী আছে, যার মধ্যে অন্যতম—

ক. 'উষা' (কো-অপারেটিভ): এটি তৈরি হয় ১৯৯৫ খ্রি.। বর্তমানে সবথেকে বড়ো এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম যৌনকর্মীদের সমবায় সংস্থা। এখানে যৌনকর্মীরা নির্ভাবনায় টাকা রাখেন এবং প্রয়োজনে লোন পেয়ে থাকেন।

খ. 'কোমলগান্ধার': এটি তৈরি হয় ১০ জুলাই ১৯৯৮ খ্রি.। কোমলগান্ধারের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে নীচের দিকে ঠেলে রাখা যৌনকর্মীরা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির বিকাশ ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতিকল্পে দৃঢ়তার সহিত কাজ করা হয়।

গ. 'আনন্দম': এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৬ জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি.। পৃথিবীর সব যৌন জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা, অধিকার, ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই আনন্দমের প্রধান লক্ষ্য। আই- পি-সি ৩৭৭ ধারায় দেহোপজীবিনীদের অপরাধী চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই ধারা তুলে দেওয়ার জন্য লাগাতার কর্মসূচী পালন করে আনন্দম।

ঘ. 'আমরা পদাতিক': এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১ মে ২০০৬ খ্রি.। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে সচেতন করে তাদের প্রচলিত ভুল ধারণাগুলিকে ভেঙে যৌনকর্মীর সন্তানদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে আমরা পদাতিক। ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় পদাতিক এই শিশুদের জন্য একটা স্টাডি সেন্টার চালু করেছে। সেখানে তাদের শেখানো হচ্ছে সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাসের শিক্ষা।

ঙ. 'রাহুল বিদ্যানিকেতন' (২০০২): সমীক্ষার জানা গেছে প্রায় পঁচাশি শতাংশ দেহোপজীবিনীরা অশিক্ষিত, তাই তাদের ওপর এত রকমের অত্যাচার ঘটে। এদের সন্তানেরা যেন একই প্রকার অশিক্ষার কবলে না পড়ে তার জন্য দুর্বারের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে বারুইপুরে। বারুইপুর ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হস্টেল আছে উলটোডাঙায়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আছে 'কোরক' বিভাগ এবং আপার প্রাইমারি শিক্ষার জন্য আছে 'দিগাঙ্গনা' বিভাগ। দুর্বারের লক্ষ্য শিক্ষার মাধ্যমে যৌনকর্মীদের ও তাদের সন্তানদের আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নতশীল জীবনযাত্রার শরিক করে গড়ে তোলা। তাদের সন্তানদের দায়িত্বশীল ও মুক্তমনের মানুষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে 'দুর্বার এডুকেশনাল সোসাইটি'।

যৌনকর্মীর সন্তানরা যাতে তাদের মায়েদের জীবনসংগ্রামকে সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেরা ভবিষ্যতে খোলা মনে যে-কোনো স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে,

তার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করে দুর্বার। দুর্বারের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ক্লাস বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি হয়েছে 'সৃষ্টি' এখানে তৈরি বিভিন্নপ্রকার খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী, পাটের ব্যাগ, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় কুটির শিল্প, বৈদ্যুতিক ছোটোখাটো খেলনা ও অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি খোলা বাজারে বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন স্টলে বিক্রি করা হয়। বর্তমানে সৃষ্টির পরিচালনার জন্য তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। দুটি কলকাতায় এবং একটি উত্তর চব্বিশ পরগনার টিটাগড়ে।

যৌনকর্মী তথা দেহোপজীবিনীদের এই সংগ্রামের ইতিহাস বহুধা বিস্তৃত; তা অল্প কথায় বলে শেষ করা অসম্ভব। তবুও স্বল্প পরিসরের আলোচনার ভিত্তিতে একটা এনজিও হিসাবে 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির' ভূমিকা আমাদের কাছে একটা বাস্তব সত্য রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুর্বারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যৌনকর্মীদের যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনের শরিক করা গেছে। এডস্ নিয়ন্ত্রণে সোনাগাছি প্রকল্প একটি দৃষ্টান্ত। 'উষা', 'কোমলগান্ধার', 'আনন্দম', 'আমরা পদাতিক', 'রাহুল বিদ্যানিকেতন', 'সৃষ্টি'— এ সবই যৌনকর্মী তথা দেহোপজীবিনীদের নিয়ে দুর্বারের আন্দোলনের প্রশংসনীয় মাইল-ফলকে 'দুর্বার' সেই আন্দোলনকে আরও বড়ো সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে চাইছে, এই প্রয়াস অবশ্যই স্বাগত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. 'নারী অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে',— আগস্ট বেবেল, অনুবাদক: কনক মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, কলকাতা- ৭০০০৭৩।
২. দুর্বার প্রকাশনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ: 'যৌনপল্লির চালচিত্র', 'বাবুদের অন্দরমহল', 'যৌনকর্মীদের জীবনসত্য', 'জীবন' যৌনতা ও যৌনকর্মী', প্রকাশক : দুর্বার প্রকাশনী, ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৬
৩. 'নারী',— হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্দশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৭
৪. 'সিমোন দ্য বোভোয়র দ্বিতীয় লিঙ্গ',— অনুবাদক: হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২
৫. 'নৈতিকতা ও নারীবাদ',— শেফালি মিত্র, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৭
৬. 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ',— মল্লিকা সেনগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭
৭. 'অর্ধেক অর্থনীতি',— শাশ্বতী ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭
৮. 'সমতার দিকে আন্দোলনে নারী' প্রথম পর্ব,— শাশ্বতী ঘোষ, প্রগ্রোসিভ পাবলিশার্স, কল ৭৩ পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৭

৯. 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি',— অমর্ত্য সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা. লি., কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৮

১০. 'নারী ও সমাজ',— আবদুল খালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৫

১১. 'Global see workers : Right Resistance & Redefination',-Kampala Kempdoo & Jo Doczema, New York, 1998'

১২. 'NGOs : A new History of Transnational Civil Socicty',] Davies, Thomas, New York, Oxford University press, 2014, ISBN 978-0-19-938753-3'

১৩. 'NGOs & Social Responsibility',-Editer by Guler Aras, Devid', Binglcy UKEmcrald Ist Ed, 2010, ISBN 978-095724-295-2.

সহায়ক ওয়েবসাইট

1. www.abcnepal.org.np
2. www.humanprafticking.org
3. www.childrenofthenight.org
4. www.durbar.org
5. www.durbar.org
6. www.ngosindia.com
7. www.smilefoundationindia.org
8. www.sangram.org
9. www.infolona.com
10. www.kranti-india.org
11. www.sahelipine.blogspot.com
12. www.rescuefoundation.net.